সমকাল

0 4 FEB 2015

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ নিয়ে বিরোধের নেপথ্যে

■ রাজীব নূর

সরেজমিন পার্বত্য চট্টগ্রাম ৫

শিক্ষকতা করে জীবন চলে না। তাই যে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, সেই জুনো পহর উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনেই একটা মুদি দোকান দিয়েছেন সুশান্ত চাকমা। রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলার ছোট হরিণার ধনুবাগপাড়ায় স্কুলটির অবস্থান। একেবারে মিজোরাম সীমান্ত লাগোয়া এই গ্রামে জুনো পহর নামে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কয়েকজন নেতাকর্মী। চাকমা শব্দ 'জুনো পহর' মানে 'জ্যোৎস্নালোকিত প্রহর'। ১৯৯৭ সালে পাহাড়কে আলোকিত করার স্বপ্ন নিয়ে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যারা, সরকারি-বেসরকারি চাকরি নিয়ে চলে গেছেন তাদের সবাই। পরে সুশান্ত চাকমার মতো কয়েকজন শিক্ষক স্কুলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আশা করছেন, সরকার যদি স্কুলটি এমপিওভুক্ত করে, তাহলে বেতন-ভাতা বাড়বে। কিন্তু তার আগে তো বেঁচে থাকতে হবে। তাই একই সঙ্গে তিনি শিক্ষক ও মুদি দোকানদার।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আর সব স্কুলের মতো জুনো পহর উচ্চ বিদ্যালয়েও একটি ছাত্রাবাস আছে। দূর-দূরান্তের পাহাড় ডিঙিয়ে যে ছাত্ররা পড়তে আসে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা না গেলে বিদ্যালয় চালানো কঠিন।

গেল ১৬ জানুয়ারি সরেজমিন জুনো পহর উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনের দিনটি ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ছাত্রাবাস ও আশপাশের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বাড়িতে পাওয়া গেল কয়েকজন শিক্ষার্থীকে। শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপে জানা গেল, এখানে বর্তমানে প্রায় ৩শ' ছাত্রছাত্রী রয়েছে। সর্বশেষ এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৫২ জন। ৮৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হলেও জিপিএ ৫ পায়নি কেউ।

রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি– গত ১৪ থেকে ২৩ জানুয়ারি পার্বত্য এ তিন জেলা সরেজমিন ঘুরে শিক্ষার এমন চিত্রই চোখে পড়েছে। জুনো পহর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ঘুরে আসার দু'দিন পর বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলায় রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পথ অতিক্রম করার সময় চোখে পড়ে অভিনব এক দৃশ্য। ব্যানার-ফেস্টুন হাতে শিক্ষক পাওয়ার দাবিতে পথে দাঁড়িয়েছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। তাদের এ দাবির প্রতি সমর্থন জানাতে এসেছেন রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ক্য বা মং মারমা, ভাইস চেয়ারম্যান ক্যসাইনু মার্মা ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাউসাং। সেখানে থেমে কথা হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক সলিমুল্লাহ সোহাগের সঙ্গে। তিনি জানান, বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১১ জন শিক্ষক থাকার কথা। আছেন মাত্র তিনজন। তারা হলেন বাংলা, ইংরেজি ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের।

এই যখন অবস্থা তখন রাঙামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করা হয়েছে। রাঙামাটি মেডিকেল কলেজে পাঠদান শুরু করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে শক্তিশালী আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এখনই পার্বত্যাঞ্চলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। গত ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাঙামাটি মেডিকেল কলেজের পাঠদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন। একই দিন জনসংহতি সমিতির সহযোগী সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদও অবরোধ ডাকে। অবরোধের এ কর্মসূচি বানচালের ঘোষণা দিয়ে মাঠে নামে ছাত্রলীগ। পরস্পরবিরোধী এই কর্মসূচিকে শেষ পর্যন্ত কারফিউ ও ১৪৪ ধারা জারি করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে।

গত ১৩ জানুয়ারি রাতে ঢাকা থেকে রাঙামাটির উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় সেখানে চলছিল চরম উত্তেজনা। রওনা দেওয়ার আগেই মনে প্রশ্ন জাগে, দেশের সব জেলা যখন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবিতে মুখর, তখন পার্বত্যাঞ্চলের মানুষ তাদের এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে দিতে নারাজ কেন?

কৌতূহলের উত্তর জানার জন্য মুখোমুখি হই পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি ও রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ানের। তিনি বলেন, রাঙামাটিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ হলে কার লাভ হবে? এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী কয়টি তৈরি হয়? উপজেলা পর্যায়ের স্কুল-কলেজের অবস্থা বর্ণনাতীত। খোদ রাঙামাটি কলেজে ৬৭ জন শিক্ষকের মধ্যে রয়েছেন ৫৫ জন। বান্দরবান কলেজে ৩৯ জনের মধ্যে ২৯ জন এবং খাগড়াছড়ি কলেজে ৪৮ জনের মধ্যে ২৮ জন শিক্ষক রয়েছেন। তার মতে, উচ্চশিক্ষার পরিবেশ তৈরি না করে পার্বত্যাঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আসলে বাঙালি পুনর্বাসনের নয়া উদ্যোগ। তিনি বলেন, আঞ্চলিক পরিষদের মতামত না নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকেও অবমাননা করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কেএস মং বলেন, চুক্তির শর্তানুযায়ী পার্বত্যাঞ্চলের জন্য যে কোনো উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার আঞ্চলিক পরিষদের মতামত নিতে বাধ্য। কিন্তু দেশের আরও কয়েকটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাঙামাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পাস করেছে। রাঙামাটিতে মেডিকেল কলেজ উদ্বোধনের পর প্রতিরোধের মুখে এখন বান্দরবানে তা স্থানান্তরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা বান্দরবানবাসীও এই মুহূর্তে বান্দরবানে কোনো মেডিকেল কলেজ চাই না।

জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজকে কেন্দ্র করে আমরা আদিবাসীরা উন্নয়নবিমুখ– এমন ভুল ধারণা প্রচার করা হচ্ছে। আমরা কখনও বলিনি যে, আমরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই না। আমরাও চাই। তার আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে জায়গাটি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে কমপক্ষে ২০০ পরিবার বাস্তুচ্যুত হবে। আমরা পার্বত্যাঞ্চলে আর একজনকেও উদ্বাস্তু করার সুযোগ দেব না।

সরেজমিন রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত এলাকা রাঙামাটি শহরের অদূরবর্তী ঝগড়াবিলের বিলাইছড়ি ও মিতিঙ্গাছড়ি পাড়ায় গিয়ে দেখা গেল, কোনো উন্নয়নের বিনিময়েই উচ্ছেদ আতঙ্কে উদ্বিগ্ন সেখানকার মানুষ আবারও উদ্বাস্তু হতে চান না। কারণ এর আগেও এই মানুষদের অনেকে তিন দফায় উদ্বাস্তু হয়েছেন। প্রথমে তারা ১৯৬০ সালে দেশে জলবিদ্যুতের একমাত্র উৎস কাপ্তাই লেকের কারণে উদ্বাস্তু হন। পরে আবার নানান রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এখান থেকে ওখানে ঘুরে থিতু হয়েছেন এখানটায়।

এরই মধ্যে ৬৫ একর জমির জন্য পাহাড়িদের ৭৪টি পরিবারের কাছে জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন থেকে হুকুম দখলের চিঠি পাঠানো হয়েছে। অথচ এ নিয়ে জানতে চাইলে রাঙামাটির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী বলেন, অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়েই জমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং কাউকেই বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হবে না।

আগামীকাল পড়ুন : সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্পে আতঙ্ক